এনায়েত কারিম

কাশ্মীর কেন জ্বলছে?

এনায়েত কারিম

সূচিপত্র

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ভূমিকা

দুনিয়ার বুকে নজরকাড়া যত জায়গা আছে, কাশ্মীরকে তাদের মধ্যমণি বললে অত্যুক্তি হবে না। জনৈক কবি এই জমিনকে দুনিয়ার স্বর্গ বলেও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অথচ আজকের দিনে কাশ্মীর আর তার সৌন্দর্যের জন্য আলোচিত নয়। যেখানে মানুষ নিরাপদ নেই, যেখানে মা-বোনের ইজ্জতের উপরে হামলা এক স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে সৌন্দর্য বিলাস কি মানায়? মজলুমের কান্নার আওয়াজ সকল মুসলমানের হৃদয়ে আগুন জ্বালাবে, এটাই বরং কাম্য। এজন্য, যে ভারতীয় বাহিনী আজ কাশ্মীর উপত্যকাকে একটা মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে তাদের নৃশংসতার বিবরণ তুলে ধরাই আজকের লেখার উদ্দেশ্য।

নিপীড়নের পটভূমি: কাশ্মীর কেন জ্বলছে?

১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দীন শাহ মীর কাশ্মীরের শাসনক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেবার পর থেকে শুরু করে ১৯৪৭ এর দেশভাগ পর্যন্ত কাশ্মীর নানা পক্ষের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিলো। ১৫৮৫ সালে মুঘল সম্রাট আকবর কাশ্মীরের দিকে হাত বাড়ান। ১৭৫১ সাল পর্যন্ত মুঘলরাই কাশ্মীর শাসন করেন। সে বছর আফগানিস্তানের দুররানি সাম্রাজ্যের আক্রমণের শিকার হয় কাশ্মীর। সেই থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত দুররানি সাম্রাজ্যের অংশ ছিল কাশ্মীর। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিং-এর কাছে দুররানি হেরে যাবার পর থেকে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ শিখদের হাতে চলে যায়। সে সময় ভারতবর্ষের বড় অংশই ছিলো বৃটিশ শাসনের অধীন।

১৮২২ সালে জম্মুর রাজা হিসেবে মসনদে আসীন হয় গুলাব সিং। সে একে একে বাল্টিস্তান, লাদাখসহ আশপাশের এলাকাগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ১৮৪৫ সালে ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয়। পরবর্তী বছর হয় সব্রওয়ানের যুদ্ধ। সেখানে নিরব থাকে গুলাব সিং। যুদ্ধের পরে দুটি চুক্তির প্রেক্ষিতে লাহোর এবং আরও কিছু এলাকা বৃটিশদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিনিময়ে সিন্ধুনদের পূর্বদিক থেকে এবং রবি নদীর পশ্চিমদিকের এলাকা- অর্থাৎ দুই নদীর মধ্যভাগের মহারাজা হিসেবে স্বীকৃতি পায় গুলাব সিং।

নানা ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় ১৯২৫ সালে কাশ্মীরের মসনদে বসে রাজা হরি সিং। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় দেশীয় রাজ্য তথা প্রিন্সলি স্টেটগুলোকে এই সুযোগ দেয়া হয় যে, হয় তারা পাকিস্তানে যোগ দিবে অথবা ভারতে। শর্তসাপেক্ষে স্বাধীন থাকারও সুযোগ পাবার কথা ছিলো তাদের। দ্য স্ট্যান্ডস্টিল এগ্রিমেন্টে-যা ছিলো উপর্যুক্ত সুযোগের স্মারক- রাজা হরি সিং স্বাক্ষর করলেও ভারত তা থেকে বিরত থাকে। ফলে হরি সিং এর স্বাধীন থাকার অভিলাষ থাকলেও তার ভাগ্যে সেটা জোটেনি। তার ধারণা ছিলো, সিদ্ধান্ত জানাতে বিলম্ব করলেই বুঝি স্বাধীন থাকা যাবে! কিন্তু তা আর হলো কই? এমনিতেও তার ব্যাপারে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ছিলোই। আর স্থানীয় সেক্যুলার সংগঠন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আব্দুল্লাহর কংগ্রেসপ্রীতির কারণে তারা ভারতে অন্তর্ভূক্তির জন্য আন্দোলন করছিল।

ন্যাশনাল কনফারেন্সের আগের নাম ছিলো মুসলিম কনফারেন্স। শেখ আব্দুল্লাহ সংগঠনের নাম ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিবর্তন এনে ভারতমুখী হয়ে যায়। যার ফলে মুসলিম কনফারেন্সেরই আরেক অংশ চৌধুরী গোলাম আব্বাসের নেতৃত্বে সংগঠনের পুরাতন নাম ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুসলিম ঐক্যের আহবান জানান। যার ফলে পাকিস্তানে যোগদানের জন্য কাশ্মীরের মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। দোগরা সৈন্যদের দ্বারা মুসলিমদের ওপর চালানো নিপীড়ন, গুম, হত্যা ও নারীদের ধর্ষণের খবর পেয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা কাশ্মীরের দোগরা রাজা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। বলা হয়, পাকিস্তানি সৈন্যদের ছত্রছায়াই তা ঘটে ছিল। তবে ইতিহাসের এই অংশ বেশ ঘোলাটে। ফলে সেখানে বিভিন্ন পক্ষের অনেক তৎপরতা সম্পর্কেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

যাইহোক, ১৯৪৭ এর অক্টোবর মাসে, রাজা হরি সিং আক্রমণের আকস্মিকতায় ভারতীয় মানচিত্রের অংশ হবার ব্যাপারে রাজি হয়ে যায়। এতে করে ভারতীয় সৈন্যরা স্রোতের মত কাশ্মীরে প্রবেশ করে। সেই থেকেই কাশ্মীর একটি জেলখানায় পরিণত হয়। যেখানে ভারতীয় সৈন্যরা জেলার আর কাশ্মীরের জনগণ বন্দি।

লাইন অভ কন্ট্রোল: জাতিসংঘের ভূমিকা কী?

কাশ্মীর একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা যা এখন ভারত, পাকিস্তান ও চীনের ত্রিমুখী বিরোধের অসহায় শিকার। তবে তা যতটা না ত্রিমুখী বিরোধের শিকার, তার চেয়ে বেশি শিকার ভারত সরকারের আগ্রাসী মনোভাবের। রাজা হরি সিং ভারতে যোগ

দিলেও কাশ্মীরের জনগণ তা মেনে নেননি, না মেনে নিয়েছিল পাকিস্তানের নীতিরির্ধারকরা। ফলে কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বেশ যুদ্ধ বেঁধে যায় ১৯৪৭ সালেই। যুদ্ধ প্রায় একবছর স্থায়ী হয়। আজকের দিনে কাশ্মীরের যে ভাগ-বাটোয়ারা তা প্রধানত ওই যুদ্ধেরই ফল। ফলে আযাদ কাশ্মীর ও গিলগিট-বাল্টিস্তান অংশটুকু আছে পাকিস্তানের অধীনে, যা কাশ্মীরের প্রায় একতৃতীয়াংশ অঞ্চল। অপরপক্ষে ভারত জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ করছে, যা কাশ্মীরের প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা। কাশ্মীরের আরেকটি এলাকার দখল রেখেছে চীন। ওই এলাকার নাম এখন আকসাই চীন। জিংজিয়াং ও তিব্বত অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এই এলাকার বিশেষ কদর রয়েছে।

সীমান্তে প্রায়ই গণ্ডগোল লেগে থাকলেও ভারত-পাকিস্তান বড় আকারের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আরও দুইবার। একটা ১৯৬৫ সালে, আরেকটা ১৯৭১ সালে। একাত্তরের যুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়ে দুই দেশ চুক্তিবদ্ধ হয়। কাশ্মীরের দুই অংশের মাঝে টানা হয় সিজফায়ার লাইন যাকে চুক্তির মধ্যে লাইন অভ কন্ট্রোল আখ্যা দেয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টায় জাতিসংঘকে একটি নির্জীব ও নির্লিপ্ত পক্ষের ভূমিকায় দেখা যায়।

জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে একটি রেজুলেশন পাশ করে যেখানে একটি গণভোটের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, যার মাধ্যমে কাশ্মীরের জনগণ তাদের মতামত জানাতে পারবে- তারা স্বাধীন হতে চায়, নাকি ভারত বা পাকিস্তানের অংশ হতে চায়। ভারতের অনাগ্রহে এই গণভোট আর কখনোই সংঘটিত হয়নি। জাতিসংঘ সে সময় একটি বর্ধিত কমিশনও গঠন করেছিল বিষয়টার দেখভালের জন্য। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিশন তাদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতার কথা স্বীকার করে নেয়। ফলে কাশ্মীরের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে জাতিসংঘের উল্লেখযোগ্য কোনো কৃতিত্ব নেই। বরঞ্চ তারা মুক্তিকামী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধকে বারবার সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতকে শক্তিশালী করেছে। যতবারই কাশ্মীরের জনগণ বিক্ষোভে রাস্তায় নেমে এসেছে ততবারই তাদের ওপর চালানো হয়েছে টিয়ার গ্যাস আর প্যালেট গান। প্যালেট গানের গুলি খেয়ে অন্ধত্ব বরণ করেছে অগণিত কাশ্মীরি। প্যালেট নিক্ষেপের ব্যাপারে আল জাজিরার আপ ফ্রন্ট অনুষ্ঠানে জিজ্ঞাসা করা হলে, ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শশী থারুর একে এই বলে বৈধতা দেবার চেষ্টা করে যে, "প্যালেট শুধু তাদের ওপরই ছোড়া হয় যারা সৈন্যদের ওপর পাথর ছুড়ে"। মানুষের জীবনকে কতটা সস্তা মনে করলে এমনটা বলা যায়!

বুক বরাবর গুলি করে অসংখ্য তরুণ-যুবাকে হত্যা করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ফোর্সের সদস্যরা। যারাই কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে বলেছে তাদেরকে হয় গুম করা হয়েছে, না হয় প্রকাশ্যে গুলি করে অন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কত মানুষকে শহীদ করা হয়েছে এর সঠিক হিসেবও জানা যায় না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং জাতিসংঘ প্রায়ই মায়াকান্না দেখালেও কখনোই কাশ্মীরি জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন তো করেইনি, বরং তাঁদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি আখ্যা দিয়ে শহীদানের রক্তকে হালাল করে নিয়েছে।

নিপীড়নের দলিল: গণকবর

২০০৯ সালের ডিসেম্বরে ইন্টারন্যাশনাল পিপল'স ট্রাইব্যুনাল অন হিউম্যান রাইটস এন্ড জাস্টিস নামের একটি সংস্থা কাশ্মীরের গণকবরগুলোর ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানায়। সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তর কাশ্মীরের তিনটি জেলা- বান্দিপাড়া, বারামোল্লা ও কুপওয়ারার ৫৫টি জেলায় নিশানাহীন অজ্ঞাত গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাতে প্রায় ২৯০০টি মৃতদেহের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। যার প্রায় ৮৭.৯ শতাংশ লাশই অজ্ঞাতনামা। সংস্থাটির আহবায়ক ড. অঙ্গনা চ্যাটার্জি বলেন, "যদি দশটি জেলায়ই স্বাধীন তদন্ত হত তাহলে এ ধারণা করা সঙ্গত যে ১৯৮৯ থেকে হওয়া ৮০০০ গুমের ঘটনার সাথে অজ্ঞাত, নিশানাহীন গণকবরের সংখ্যার সাথে এর একটা সম্পর্ক পাওয়া যেত"।[১]

সেই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভারতীয় সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর তৎপরতায় ৮০০০ গুমের ঘটনা ছাড়াও ৭০০০০ লোক ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এসবের মধ্যে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও হাজতে নির্যাতনের ঘটনায় মৃত্যুও অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ষণ: ভারতীয় বাহিনীর আরেক অস্ত্র

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে এক জঘন্য ঘটনা ঘটে যায় জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়া এলাকায়। ৮ বছর বয়সী এক মেয়ে তার পরিবারের ঘোড়াগুলোকে ঘরে আনতে বেরিয়ে যায়। ঘোড়াগুলো ফিরেছিল বটে, ফিরেনি আসিফা বানু, ৮ বছরের ছোট্ট

---

[১] Angana Chatterji, Buried Evidence: Unknown, Unmarked, and Mass Graves in Kashmir.

মেয়েটি। পরে জানতে পাওয়া যায় মেয়েটিকে অপহরণ করা হয়েছিল। তারপর রাসনা গ্রামের একটি মন্দিরে তাকে আটকে রেখে গণধর্ষণ করে মন্দিরের পুরোহিতসহ কয়েকটি নরপিশাচ! শারীরিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে তারা আসিফার মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করে। তার লাশে পাওয়া যায় নির্যাতনের ভয়াবহ চিহ্ন।

পুরো ঘটনার পরিকল্পনা করে ৬০ বছরের বুড়ো, সানজি রাম, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা। তাকে সাহায্য করে স্থানীয় কিছু পুলিশ। সুরেন্দ্র ভার্মা, আনন্দ দত্ত, তিলক রাজ, খাজুরিয়া- এরা হলো পুলিশ নামের সেই নরপিশাচ যাদের নির্মমতা থেকে একটা বাচ্চা মেয়েও রেহাই পায়নি! ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এই গণধর্ষণের ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টির দুই নেতা মিছিল বের করে। আসিফাকে যখন তার পরিবার দাফন করতে যায় তখনও কট্টরপন্থী হিন্দুরা তাদেরকে বাধা দেয়।[২]

আসিফা বানুর ঘটনাই কাশ্মীরের একমাত্র বা বিচ্ছিন্ন একটি ধর্ষণের ঘটনা নয়। কাশ্মীরি মুসলমানদেরকে দমিয়ে রাখতে ধর্ষণ ও গণধর্ষণকে একটি অস্ত্র হিসেবে বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে ভারতীয় বাহিনী ও প্রশাসন। ১৯৪৭ সালে যখন কাশ্মীরে যুদ্ধ বেঁধে যায় তখন দোগরা সেনা ও ভারতীয় সেনা মিলে মুসলিম পুরুষদেরকে হত্যা ও নারীদেরকে ধর্ষণে মেতে উঠেছিল।

১৯৯০ এর দশকে ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে তল্লাশির নামে পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে যেত আর নারীদেরকে গণধর্ষণ করত। ১৯৯১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কুপওয়ারা জেলার কুনান নামের ছোট্ট একটি গ্রামে এরকম ঘটনা ঘটে। বহু বছর ধরে ওই গ্রামের নারীরা এই লাঞ্ছনার দাগ বয়ে বেড়াচ্ছেন। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্যমতে সেদিন ২৩ থেকে ১০০ জন নারী ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। পুরো জনগোষ্ঠীকে ভীতিসন্ত্রস্ত করে তোলাই এসব জঘন্য কাজের উদ্দেশ্য।[৩]

---

[২] https://www.bbc.com/news/world-asia-india-43722714

[৩] https://www.bbc.com/news/world-asia-41268906

আইনের মারপ্যাঁচে দখলদারিত্ব

১৯৪৮ এ স্থানীয় জনতার কোনোরকম সম্মতি ছাড়াই কাশ্মীরের ভারতভুক্তির মাধ্যমে ওই অঞ্চলে ভারতের দখলদারিত্বের সূচনা হয়। তারপর সেখানকার জনগণের ওপর যে নিপীড়ন চালায় ভারতীয় বাহিনী, সেগুলোকে আইনি বৈধতা দেবার চেষ্টা তারা সব সময় থেকে করে এসেছে। ২০১৬ সাল পর্যন্তও সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে কাশ্মীরী মুসলমানদের ওপর সবরকম নিপীড়ন চালাত, তাদেরকে কখনো জবাবদিহি করা লাগত না। হত্যা-ধর্ষণ বা ক্রসফায়ারের নাটক হোক, কিছুর জন্যই কোনো জবাবদিহিতা ছিল না। আবার চাপের মুখে বা লোক দেখানোর জন্য আইনে কিছু রাখলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ দেখা যায়নি। যেন কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই।

১৯৫৪ সালে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির আদেশে ভারতীয় সংবিধানে একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা আর্টিকেল ৩৭০ নামে পরিচিত। সেই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কাশ্মীর একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। তার আলাদা সংবিধান, পতাকা ও স্বায়ত্তশাসন থাকবে। সেখানে ভারতীয় সংবিধানের কতটুকু কার্যকর থাকবে তার সীমারেখাও উল্লেখ করা হয়।

২০১৯ সালে ভারতীয় দখলদারিত্বের ধারাবাহিকতায় ৩৭০ অনুচ্ছেদ এবং এর অধীনের ৩৫ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ভারত। ফলে ভারতের যেকোনো অঞ্চলের লোকেরা কাশ্মীরে জমি কিনতে পারবে এবং কাশ্মীরী নারীদেরকে বিয়ে করতে পারবে। এর মাধ্যমে নামে মাত্র কাশ্মীরী জনগণের টিকে থাকার যে স্বীকৃতি ছিল, তাও ছিনিয়ে নেয় ভারত সরকার। এর মাধ্যমে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপির সরকার এই ইঙ্গিত দিল যে, কাশ্মীর আর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থাকার সুযোগ নেই। এখন বাইরের লোকেরা (মূলত উগ্র হিন্দুরা) জমি দখল করে কাশ্মীরের ডেমোগ্রাফি বা জনমিতি বদলে দিবে। এ ব্যাপারে কেউ যেন টু-শব্দ করতে না পারে সেজন্য তারা কাশ্মীর উপত্যকায় লাখ লাখ সৈন্য নিয়ে আসে। ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। স্কুল, মাদরাসা ও মসজিদও বন্ধ করে দেয়। এমনকি মুসলমানদেরকে জুমার নামাজ পর্যন্ত পড়তে বাধা দেয়। যেমনটা ইসরায়েলের ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের সাথে করে থাকে। দেশে দেশে মুসলিমদেরকে ভূমিহীন করার এ এক পরিচিত রূপরেখা। প্রথমে আইন-আদালতের মুলা দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে সময়মত ঠিকই তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে দেশছাড়া করে, হত্যা করে অথবা জেলে পুরে রাখে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের কী করার আছে?

একথা সত্য যে, পাকিস্তান কাশ্মীর 'রক্ষায়' ভারতের সাথে দফায় দফায় যুদ্ধে জড়িয়েছে। কিন্তু তথাকথিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে পাকিস্তানের যে দৃঢ়তা মুসলিম আমজনতা আশা করে আসছেন, সেটা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সামরিক বাহিনীর মাঝে খুব একটা দেখা যায়নি। কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের দোদুল্যমানতা কাশ্মীরী মুক্তি সংগ্রামের গতিকে সবসময়ই পেছনে টেনে ধরেছে। পাকিস্তান বারবার কাশ্মীর ইস্যুকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করেছে। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সংগঠনগুলোকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করেছে, যাতে ভারতের বিরুদ্ধে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাদের। পাকিস্তান কখনো আন্তরিকভাবে কাশ্মীরের জিহাদকে সমর্থন করেনি। কখনোই সমর্থন করেনি ইসলাম ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে। তারা কেবল জাতীয়তাবাদী ও কূটনৈতিক হিসেবনিকাশের অংশ হিসাবে কাশ্মীরকে দেখেছে। পাকিস্তানের ভূমিকা সংক্ষেপে ও যথোপযুক্তভাবে ফুটে উঠেছে শাইখ আবু মুসআব আস-সুরির এই একটি বাক্যে – ‘পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যুর ব্যবসা করেছে’।

২০১৯ এ সাবেক পাকিস্তানি কূটনীতিক মুনির আকরাম লিখেছেন, “কাশ্মীরী স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে এমন একটি স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া দরকার যা রাজনৈতিকভাবে রক্ষণসাধ্য। একদিকে যেমন এই সংগ্রামের বৈধতা প্রচার করতে হবে আন্তর্জাতিক আইন ও অসংখ্য ইউএন রেজ্যুলেশনের পাটাতনে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে ইসলামাবাদের উচিৎ নিষিদ্ধঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সাথে দূরত্ব বজায় রাখা, যারা সম্ভাব্য লড়াইয়ের মধ্যে [অনাহুত] ঢুকে যেতে পারে”।[8]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটাই পাকিস্তানের বহুদিন থেকে লালন করে আসা অবস্থান। তারা একমুখে মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনের কথা বলে; আবার সেই একই মুখেই সংগ্রামী মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়।

কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের অবস্থান গভীরভাবে বুঝতে গেলে চীনের উইঘুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্মূলীকরণ কর্মসূচির কথা মাথায় রাখতে হবে। চীন হলো পাকিস্তানের ‘উন্নয়নের’ সবচে’ বড় অংশীদার। এ কারণে উইঘুরদের উপর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বর্বরতা নিয়ে পাকিস্তান মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। পাকিস্তানের

[8] https://www.dawn.com/news/1502890

এমন চরিত্র বহু পুরাতন। তারা আমেরিকার তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধেরও অংশীদার। এই অংশীদারত্বের খেসারতস্বরূপ চল্লিশ হাজার পাকিস্তানিকে জীবন দিতে হয়েছে। আফিয়া সিদ্দিকিসহ বহু নিরাপরাধ মানুষকে অর্থের বিনিময়ে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করেছিল এই তারাই। আর এসব আলোচনা কাশ্মীর ইস্যুতে এজন্যই খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ কাশ্মীরীদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য যে নৈতিক চরিত্র দরকার, সেটা তথাকথিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের নেই। এ কথাটি উপলব্ধি করা মুক্তিকামী মুসলিম জনতার জন্য অনেক বেশি জরুরি। এতে প্রকৃত শত্রু-মিত্র চেনা সকলের জন্যই সহজ হবে।

শেষ কথা

আখেরে কথা হলো, গুম, হত্যা ও ধর্ষণের মাধ্যমে দখলদারিত্বের ধারাবাহিকতা অনেক দীর্ঘ। ভারত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থাপনায় ধর্ষণের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ এজন্যই সংঘটিত হচ্ছে যাতে মুসলমানরা দমে যায়। যেন তারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দাবি থেকে সরে এসে ভারতের আনুগত্য মেনে নেয়। কখনো তারা যেন আযাদীর নাম মুখে না আনে। এটাই তাদের চিরায়ত আকাঙখা। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ

"তারা (কাফেররা) ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পাল্টা) কৌশল প্রয়োগ করলেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী"। -সুরা আলে ইমরান (০৩) ৫৪

এজন্য কাশ্মীরের মাটিতে মুজাহিদরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। যাতে কাশ্মীর ও সমগ্র ভারতবর্ষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা যায়। কুফর ও শিরকে ভরপুর এই জাহেলি সমাজব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম ভূমিকে মুক্ত করার মহান ব্রত নিয়ে জিহাদে অংশ নিচ্ছেন কাশ্মীরের আপামর শ্রেণির মুসলমানরা।

মুসলমান জাতি একটি দেহের ন্যায়। তাই কোনো মুসলিম ভূমি হাত ছাড়া হয়ে গেলে কিংবা কোনো মুসলিমের ওপর অন্যায় আঘাত আসলে সারা বিশ্বের মুসলমানদের দায়িত্ব হলো ওই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। কোনো অবস্থাতেই আমাদের ভুলে

যাওয়া উচিৎ নয় যে, দুনিয়ার যেকোনো জায়গায় যে-ই কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেছে, সে-ই আমাদের ভাই। কেউ কি তার ভাইকে হিংস্র জন্তুর খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার বসে থাকতে পারে?

***